উপলব্ধি

হৃষিকেশ সেনগুপ্ত

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

সমরকন্দ	৭
চিঠি	১০
রাজাবাহাদুর	১২
পার্কস্ট্রিট	১৭
অ্যান্টিক	২১
সেই মেয়েটি	২৮
ছাতা	৩০
রেলগাড়ি	৩৩
উপলব্ধি	৩৫
পারফিউম	৩৭
উচ্ছিষ্ট	৪২
ভাপা ইলিশ মাছ	৪৯
তোমাকে	৫১
খোলা জানলা	৫৬
বৃষ্টি	৬১

সমরকন্দ

ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা চওড়া এক কাবুলিওয়ালা। 'স্লামালেকুম' বলে অভিবাদন করে দরজাটা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকেই মনে হল চন্দ্রনাথ ভুল করে পেশোয়ারের কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছেন। এর অবয়বটি জীর্ণ না হলেও মলিন। অনেকদিন রঙের প্রলেপ পড়েনি। মোটা মোটা থামগুলোর ভাঙা টালিগুলো বদলানো হলেও অন্যগুলোর সঙ্গে ম্যাচ করেনি। মেঝে এবড়োখেবড়ো। সমস্ত পরিবেশটিতে একটা প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে। বেয়ারারা সবাই কাবুলের লোক। পরনে ঢিলে কালো পাজামা, আজানুলম্বিত কালো রঙের কুর্তা এবং মাথায় লম্বাটে ধরনের কালো শিরস্ত্রাণ।

বাঙ্গালোরের বুকে কাবুলের ঐতিহ্যবহনকারী এই রেস্তোরাঁটি নামি এবং দামি। পরিবেশের গুণে এখানে চিৎকার, চেঁচামেচি এবং হট্টগোলের শেষ নেই। দাম বেশি হলেও সমরকন্দ রেস্তোরাঁটির খাবার সুস্বাদু ও মুখরোচক।

বয়সের ভারে চন্দ্রনাথ আজও ক্লান্ত হননি। ভোজনরসিক এবং আড্ডাবাজ। চিরটাকাল সাহেবি কায়দাকানুনের মধ্যে থেকেছেন। কাঁটা চামচ না হলে খেতে পারেন না। সকালে ব্রেকফাস্টের আগে ফ্রুট জুস চাই। দুধ ও কর্নফ্লেক্স দিয়ে ব্রেকফাস্টের শুরু, এক কাপ কালো কফি দিয়ে তার পরিসমাপ্তি। তারপরে গাড়ি নিয়ে সোজা গলফ ক্লাব। যৌবনে ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলেন। শনিবারে পার্টি অথবা ক্লাব। সেখানে দু'এক পেগ হুইস্কি খান। স্ত্রীর আপত্তিতে তৃতীয় পেগ খাননি আজ পর্যন্ত।

এ ধরনের সাহেবি মানুষকে অলোক শেষ পর্যন্ত নিয়ে এল সমরকন্দে? প্রথমে একটু হতাশই হয়েছিলেন। এখন কিন্তু ইন্টারেস্টিং লাগছে। কিছুক্ষণের জন্য না হয় নিজেকে নিয়ে গেলেন পেশোয়ারের সরাইখানায়?

সৈয়দ মুজতবা আলি চন্দ্রনাথের একজন প্রিয় লেখক। ওরকম উইটি এবং হিউম্যারিস্ট লেখক চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় কাউকে খুঁজে পাননি। তাঁর লেখা 'দেশে-বিদেশে' বইটা অনেকবার পড়েছেন। কাবুলের টুকরো টুকরো স্কেচগুলো পরিষ্কার মনে পড়ছে। সেখানকার সরাইখানার একটা 'রেপ্লিকা'য় যেন তিনি বসে রয়েছেন।

মেনুকার্ডের বদলে টেবলয়েড ফর্মে দুপাতার একটা খবরের কাগজ। সেখানে অন্যান্য বিজ্ঞাপনের পাতা জুড়ে খাবারের মেনু। প্রায় ছ'ফিট লম্বা গৌরবর্ণ একজন কাবুলি এসে টেবিলের ওপর একটা বোতল রেখে দিয়ে গেল। চন্দ্রনাথ মনে করলেন ওটা হয়তো ওয়াইনের বোতল। পরে হাতে নিয়ে দেখলেন ওর সমস্ত গা জুড়ে বিভিন্ন পানীয়ের নাম। অদূরে বার্‌সি নজরে পড়ল। সবরকম সফ্‌ট্‌ এবং হট ড্রিংকসই সে বারে পাওয়া যায়।

অনেকদিন পরে বিয়ার খেতে ইচ্ছে হল। কাবাব টিকিয়ার সঙ্গে বিয়ার জমবে ভালো। এ পর্যন্ত কোনো কাঁটা-চামচ টেবিলে রাখা হয়নি। সম্ভবত মূল খাবারের আগে রাখবে।

পাশের টেবিলে এক বিদেশি দম্পতিকে নজরে পড়ল। তারা কিন্তু দিব্যি হাত দিয়ে রুটি-গোস্ত খাচ্ছে। চিকেনের হাড় চিবুতে হলে হাতই সুবিধেজনক।

ওদের টেবিলে শেষ পর্যন্ত কাঁটা চামচ এল না। অলোকের স্ত্রী দেবলীনা বলল যে এ রেস্তোরাঁয় সবাইকে হাত দিয়েই খেতে হয়।

নিরুপায় চন্দ্রনাথ। কী আর করেন? হাতেরই সদ্ব্যবহার করলেন। মন্দ লাগছে না হাত দিয়ে খেতে। টিকিয়াটা যে ডিলিশাস তাতে সন্দেহ নেই। 'ডিলিশাস' শব্দটাকেই উপযুক্ত মনে হল। 'সুস্বাদু' শব্দটা তো তুলনায় ভালো।

দম্‌ গোস্ত আর বাটার নান্‌ খেয়ে তৃতীয় আইটেম 'চিকেন মশল্লা' পুরোটা খেয়ে শেষ করা গেল না। চন্দ্রনাথ যেটুকু খেলেন তার স্বাদ টিকিয়ার চাইতেও ভালো মনে হল। উদ্ধৃত খাবার প্যাক করে দেওয়ার রেওয়াজ এর রেস্তোরাঁয়ও নিশ্চয় আছে। কাল সকালে রুটির সঙ্গে 'চিকেন মশল্লা' জমবে ভালো।

একটা কাবুলিওয়ালার কথা খুব মনে পড়ছে। শীতের সময় ওদের শহরে আসত। সঙ্গে থলে-ভর্তি শুকনো ফল-পেস্তা, বাদাম, আখরোট ও কিশমিশ। লোকটার নাম আজও মনে আছে — ইরফান। চন্দ্রনাথের বাবা প্রচুর ফল কিনতেন। মার নির্দেশে দুপুরের খাবার ইরফান ওদের বাড়িতেই খেত। দেশবিভাগের পরে ইরফানকে এদিকে আসতে দেখেনি কেউ। সম্ভবত পাকিস্তানেই রয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক শীতে ওর আসবার জন্য প্রতীক্ষা করতেন চন্দ্রনাথ। সুদূর কাবুল থেকে উত্তর বিহারের এই অনুন্নত শহরে দুটো পয়সা উপার্জনের জন্য ফল বিক্রি করতে আসা জোব্বা চাপানো ইরফানকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন চন্দ্রনাথ। আজ অনেকদিন পরে সমরকন্দে

কাবুলিওয়ালার সাক্ষাৎ পেলেন। পুস্তু ভাষা জানেন না, তাই ওর বোধগম্য হওয়ার জন্য সেই দীর্ঘকায় কাবুলিওয়ালাকে বললেন — গুড্ ফুড্, থ্যাঙ্ক ইউ।

রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। হাতে রয়েছে সেই উদ্বৃত্ত খাবারের প্যাকেটটা। দেবলীনাকে অলোক বলল — চিকেনটা বাবাকেই দিও। বাবা চিকেন ভালোবাসেন।

গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভ করবে দেবলীনা। ওর পাশে বসেছে অলোক।

এমন সময় একটা ভিখারিনি এসে চন্দ্রনাথের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কানাডা ভাষায় কী যেন বলল। সম্ভবত ভিক্ষে চাইছে। মেয়েটি গর্ভবতী, শীর্ণ হাত-পা। না খেতে পারার চিহ্ন সর্বাঙ্গে। চন্দ্রনাথ ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করেন। পরিশ্রমবিহীন উপার্জনের সহজতম উপায় এই ভিক্ষাবৃত্তি।

আজ কিন্তু এ ভিখারিনিকে দেখে মায়া হল। পার্স খুলে একটা টাকা ওকে দিতে গেলেন। মেয়েটা তো টাকা নিল না। ওর দৃষ্টি রয়েছে চন্দ্রনাথের পাশে রাখা প্যাকেটটার দিকে। লুব্ধ ও ক্ষুধার্ত সে দৃষ্টি। একটু খাবারের জন্য ওর দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা ও আর্তি দেখে বিচলিত বোধ করলেন চন্দ্রনাথ।

দেবলীনার গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। ভিখারিনিটা গাড়ির পাশ থেকে সরে গেল।

কী বোকা রে মেয়েটা? টাকাটা নিলে কিছু কিনে তো খেতে পারত!

হঠাৎ যেন চন্দ্রনাথ ভিখারিনির জঠরস্থ শিশুটির কান্না শুনতে পেলেন। খিদের কান্না। সে কান্নায় নিজেকে বড়ো অস্থির লাগছে। একরকম আদেশের সুরেই দেবলীনাকে বললেন — গাড়িটা থামাও বউমা।

গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিখারিনীটা দৌড়ে এল গাড়ির পাশে। হাত পাতল চন্দ্রনাথের কাছে। এবার কিছু না বলেই ওর হাতে চন্দ্রনাথ তুলে দিলেন খাবারের প্যাকেটটা। তারপর তৃপ্তিভরা সুরে চন্দ্রনাথ দেবলীনাকে গাড়ি চালাতে বললেন।

চিঠি

একটা খোলা চিঠি যেন ওর জীবনটাকে পালটে দিল। বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছে। ছ'তলার ব্যালকনিতে বসে চিঠিটা পড়ল কয়েকবার। যে অধ্যায়কে পরিসমাপ্ত মনে করে নিজের মনকে শাসন করে রেখেছিল এতদিন, আজ যেন বাঁধনছাড়া হয়ে সেই মন উচ্ছ্বাস ও আবেগে নন্দিনীকে দিশেহারা করে দিয়েছে। অভিমন্যু ডাকছে ওকে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবে কেন নন্দিনী?

বাবা মারা যেতে মার ও ভাইয়ের পুরো ভার নিতে হল ওকে। নিজের আর এম.এ. পড়া হল না। একটা স্কুলে চাকরি জুটে গেল। অভিমন্যু কিন্তু এগিয়ে এসেছিল — ওদের সমস্ত ভার নিতেও রাজি। নন্দিনী কিন্তু বেঁকে বসল। জামাইয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেন ওর আদরের মা, তা চায়নি নন্দিনী। কাজেই অভিমন্যুকে তখন বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। নন্দিনী স্কুল আর ট্যুইশানি নিয়ে থাকে। বাবলু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। মা মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না বলে ক্ষুব্ধ। সময়ের ব্যবধানে অভিমন্যু সরে গেল দূরে। — মুম্বাই না পুণে কোথাও চাকরি নিয়ে। নন্দিনীর সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রইল না।

মা মারা গেলেন গত বছর। বাবলু এবারই চাকরি নিয়ে চলে গেল ব্যাঙ্গালোরে। নন্দিনী পড়ে রইল ওদের সাবেকি বাড়িতে স্কুল আর ছাত্র পড়ানো নিয়ে। এরই মাঝে কখনও কখনও বসন্তের হাওয়া এসে মনটাকে উদাস করে দেয়। অভিমন্যুকে বড়ো মনে পড়ে। ও কোথায়? কী করছে এখন? বিয়ে করেছে কি?

আজ চিঠিটা খুলেই অবাক। অভিমন্যুর চিঠি। ডাক দিয়েছে ওকে। খোলা চিঠিটা টেবিলের ওপরে রাখা। ব্যালকনিতে বসেই নন্দিনী পরীক্ষার খাতা দেখে। আজ বিরক্তিকর খাতা দেখার বদলে দেখছে অভিমন্যুর সাড়া-জাগানো চিঠি। চিঠিটা অনেকবারই পড়া হয়ে গিয়েছে। এক অদ্ভুত শিহরণ জাগানো আহ্বান। একে উপেক্ষা করার ক্ষমতা নন্দিনীর নেই। আকাশ

ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। এমনই এক বৃষ্টিঝরা দুপুরে দু'জনে ভিজেছিল দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার পাড়ে। এই মুহূর্তগুলো কি শুধু সুখ-স্বপ্নে বিভোর হওয়ার জন্য?

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া হল। সে হাওয়ায় উড়ে গেল খোলা চিঠিটা। ওটাকে কিছুতেই আটকাতে পারল না নন্দিনী। উড়তে উড়তে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে চিঠি যার মধ্যে অভিমন্যুর ঠিকানাটা ছিল!